শ্রীম ও কথামৃত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব জগতের মহাসৌভাগ্যের বিষয় এবং মানবজাতির অশেষ

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা
সম্পাদিকা, বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

কল্যাণের কারণ। তিনি মাত্র পঞ্চাশটি বছর ইহজগতে যাপন করেছিলেন। সেই লীলার একটি বড় অংশ তাঁর কথামৃত। তিনি সরল-মধুর ভাবে ও ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন, নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছেন—সেগুলি মানবজাতির সম্পদ। তাঁর জীবৎকালে আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না, তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। আবার তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর বাণী আজ আমরা একটি গ্রন্থের মাধ্যমে অনেকখানি পাই। সেটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।'

কথামৃত সংকলন করেছেন যিনি, 'মাস্টারমশাই' নামে তিনি নিজেকে পরিচিত করেছেন সবার কাছে, যেহেতু পেশায় তিনি ছিলেন শিক্ষক। ঠাকুরও তাঁকে মাস্টার বলে ডাকতেন। সম্পূর্ণ নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আবাল্য ধর্মপ্রাণ। কলকাতায় থাকতেন। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা তাঁকে মুগ্ধ করত। ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে তিনি অংশ নিতেন।

কলকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। পিতামাতা ছিলেন ধর্মপরায়ণ। মায়ের স্নেহ ও শিক্ষা মহেন্দ্রনাথকে উচ্চ ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পিতারও প্রভাব ছিল তাঁর চরিত্রে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পরে এফ এ (এখনকার হায়ার সেকেন্ডারি) পরীক্ষায় পঞ্চম হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন কৃতিত্বের সঙ্গে। তিনি শুধু মেধাবী ছিলেন তা-ই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরেও তাঁর অধ্যয়নের জগৎ ছিল বিপুল।

যখন মাত্র চার বছর তাঁর বয়স, তিনি তাঁর মা এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে মাহেশের রথযাত্রায় যান। ফেরার সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাঁরা

অবতরণ করেন। সেখানে সবাই বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখছেন যখন, চার বছরের শিশু জননীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাঁদতে থাকেন। তখন মন্দির থেকে বাইরে এসে এক সৌম্যপুরুষ শিশুর মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দেন; তাঁর কান্না বন্ধ হয়। পরে তিনি দলের সঙ্গে আবার যুক্ত হন। মহেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেন-না সেইসময় তিনি দেবালয়ের পূজারিরূপে কর্মরত ছিলেন।

পড়া শেষ হতে না হতেই তাঁর বিবাহ হয় কেশবচন্দ্র সেনের কোনও আত্মীয়া কন্যার সঙ্গে। একটি সদাগরি অফিসে কর্ম স্বীকার করেন তিনি। কৈশোরেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, তাতে তিনি খুবই মর্মাহত হন। কিন্তু জননী তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে বলেন, ''এতদিন আমি তোকে যেমন লালনপালন করেছি, এরপরেও তেমনি করব; শুধু তুই আমায় দেখতে পাবি না।'' মাস্টারমশাই মনে করতেন পরে মা কালী—স্বয়ং জগদম্বাই তাঁর লালনপালনের ভার নিয়েছিলেন। তারপর তিনি শিক্ষাকর্মে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন। বিভিন্ন স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর গম্ভীর সৌম্য ব্যক্তিত্ব আর সহজ পাঠদানপ্রণালী শিক্ষক ও ছাত্রদের খুব আকৃষ্ট করত। অত্যন্ত শান্তভাবেই তিনি প্রশাসনের কাজ চালাতেন। কখনও কখনও তাঁকে কোনও কোনও কলেজেও সাময়িক অধ্যাপনার কাজ করতে হত। একইসঙ্গে তিনি স্কুল এবং বিভিন্ন কলেজে ক্লাস করতেন। তিনি খুবই অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন কিন্তু কাজকর্মে সময়-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পালকি ব্যবহার করতেন। অধ্যাপনা করতেন বিভিন্ন বিষয়ে। ইংরেজি, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস—এইসমস্ত বিষয়ে তাঁর অনায়াস বিচরণ ছিল। যখন যেমন প্রয়োজন হত তাই পড়াতেন। তবে কোনও গর্ব ছিল না, 'আমি মাস্টার' বলে নিজেকে সামান্য শিক্ষক হিসেবে প্রকাশ করতেন।

বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই পারিবারিক ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি খুবই কষ্ট পান এবং কলকাতার বাড়ি, সংসার ছেড়ে বরানগরে দিদির বাড়িতে, ঈশান কবিরাজের কাছে কয়েকদিন ছিলেন। সেই অবস্থানের মধ্যেই এক বন্ধুস্থানীয় যুবক সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, যিনি কথামৃত গ্রন্থে সিধু বলে উল্লিখিত, মাস্টারমশাইকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নিয়ে যান। সেটা ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, বসন্তকাল। মাস্টারমশাই আর সিধু সেখানে গিয়ে প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসকক্ষের কাছে দাঁড়ান এবং দেখতে পান যে একঘর মানুষ বসে আছেন আর একজন ব্যক্তি তক্তপোষে বসে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছেন। সেই প্রথম দর্শনেই মাস্টারমশাইয়ের বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা জাগে। তাঁর অমর পঙ্‌ক্তিগুলি : ''তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য

পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণকীর্তন করিতেছেন।”

তিনি সুশৃঙ্খল মনের মানুষ। তাই ভাবলেন, ‘‘একবার দেখি কোথায় এসেছি।” বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির দর্শন করে আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে এলেন সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। তখন ঘরের দরজা বন্ধ। মাস্টারমশাই লিখেছেন, তিনি ইংরেজি-পড়া মানুষ, তাই অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকতে পারলেন না। সেখানে ‘বৃন্দে ঝি’ ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?” বৃন্দে বলল, ‘‘আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে!” বৃন্দা কিন্তু সাধারণ রমণী হয়েও ঠাকুরের অসামান্য জ্ঞানের কিছুটা পরিমাপ করতে পেরেছিল। বুঝেছিল যে, বই পড়ার সঙ্গে এই মানুষটির কোনও যোগ নেই। ঘরে একখানিও বই নেই, অথচ কত মানুষ তাঁর কাছে এসে সৎপ্রসঙ্গ শোনেন—সেটা সে লক্ষ করেছে। মাস্টারমশাই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সাধুটি এখন সন্ধ্যা করছেন কি না, আর তাঁরা ঘরের ভিতর যেতে পারেন কি না। বৃন্দে বলল, ‘‘তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বস।”

তাঁরা ভিতরে গেলে ঠাকুর বসতে বললেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎকার। কয়েকটি মাত্র কথা হল। মাস্টারমশাইয়ের পরিচয় নিলেন ঠাকুর। তাঁরা ফেরার সময় তিনি সস্নেহে বললেন, ‘‘আবার এস।” এই অল্প কয়েকটি কথাতেই ঠাকুরের স্নেহ, আন্তরিকতায় মাস্টারমশাই মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে আপন জেনেছেন তাই আবার আসতে বলছেন, এটা তাঁর বিশ্বাস হল। মনে হল, এমন একটি মানুষের কাছে আবার ফিরে আসতে হবেই। কাল বা পরশু আসবেন—একথাও তিনি ভাবলেন।

চার বছর মাস্টারমশাই ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন। মাস্টারমশাই গৃহস্থ, তাঁর পেশা শিক্ষকতা, সংসার পালনের দায়িত্ব রয়েছে। তাই তিনি কেবল রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিন হলে তবেই দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারতেন।

ঠাকুরের জীবনের একটা অপূর্বতা যে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ত্রিশ বছর বাস করেছিলেন কিন্তু তাঁর উৎসাহ, আগ্রহ, প্রয়োজন ছিল কলকাতায় আসার। প্রায়ই তিনি কলকাতায় আসতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যেতেন। খুব কমই রাত্রিবাস করেছেন কলকাতায়। সেও কেবল বলরাম বসুর বাড়িতে, আর কোথাও না। আসতেন ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে, বিভিন্ন ভক্ত মানুষ অথবা জ্ঞানীগুণী, খ্যাতিমান ব্যক্তির কাছে। ঠাকুরের আগ্রহ তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। আমরা মনে করি, নিজের বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে, তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য কী জানতে এবং তাঁদের চেতনা প্রবুদ্ধ করতেই ঠাকুর আসতেন। মাস্টারমশাই জানতে পারলে সেখানে সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গ করতেন। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল প্রতিদিনের দিনলিপি রাখা। যখন যেখানে যে-অবস্থায় ঠাকুরকে তিনি দর্শন করেছেন সেকথা সাল তারিখ বার নক্ষত্র সহ লিখে রেখেছেন। ঠাকুরের আলাপ, অন্যান্য ভক্ত ও মানুষদের আসা-যাওয়া, তাঁদের প্রশ্ন ইত্যাদিও তিনি লিখে রাখতেন। রোজই লিখতেন সংক্ষেপে, পরে সেগুলি আবার ধ্যান করে চিন্তা করে বিস্তারিতভাবে লিখতেন। লিখতেন কিন্তু একেবারেই নিজের জন্য। ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ার সময় থেকেই টাউন হলে বা ব্রাহ্মসমাজে বা অন্য কোথাও ধর্মসভা বা জ্ঞানপূর্ণ আলোচনাসভা হলে তিনি নোট করে রাখতেন। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তারিখ, বার, নক্ষত্র সব দিয়ে তিনি লিখতেন। তাই তাঁর নোট এত প্রামাণিক। মাস্টারমশাই কথামৃতে তাঁর উল্লিখিত প্রতিটি কথার প্রমাণ দিয়েছেন। ঠাকুরের নিজের মুখের কথা, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তানদের ও গৃহস্থ ভক্তদের কথা, ঠাকুরকে দর্শনকারী মানুষদের মন্তব্য—এসবই তাঁর তথ্য। তবে তিনি নিজেরই

আনন্দের জন্য, নিজেরই শিক্ষার জন্য দিনলিপি লিখতেন, কারও জন্য নয় এবং অনেকদিন পর্যন্ত সেটা আর কেউ জানত না।

১৮৯৭ সালে 'Gospel of Sri Ramakrishna' (শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ) ছোট আকারে ছাপানো হল। স্বামীজী অভিভূত হয়ে ভূরি ভূরি প্রশংসা করে লিখলেন (১২ অক্টোবর ১৮৯৭), ''এখন আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। আপনার পুস্তিকা প্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ... তা দিনের আলোতে বেরিয়ে আসুক!'' ওই বছরেই দ্বিতীয় খণ্ড বেরোলে স্বামীজী মাস্টারমশাইকে লিখলেন (২৪ নভেম্বর ১৮৯৭), ''বইটি সত্যিই অপূর্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতঃপূর্বে আর কোন জীবনচরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক এইভাবে নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অনুরঞ্জিত না করে প্রকাশ করেননি।... আমি যে বইটি কতটা উপভোগ করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়।... এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়ে ছিল।''

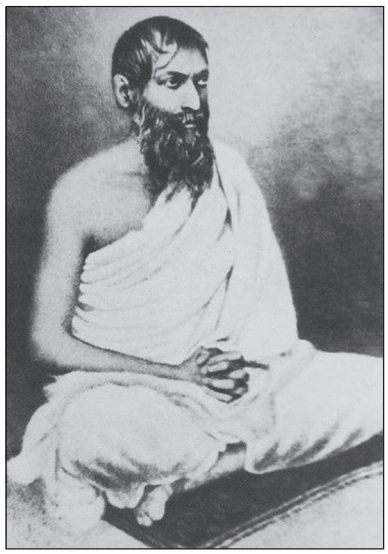

দক্ষিণেশ্বরে, স্বামী শিবানন্দজী তখন তারক, একবার ঠাকুরের কথাগুলি শুনতে শুনতে লিখে নিতে লাগলেন। কদিন দেখার পরে ঠাকুর বারণ করলেন। আসলে মাস্টারমশাইয়ের জন্য এটি নির্দিষ্ট রয়েছে বলে ঠাকুর বুঝেছিলেন। মাস্টারমশাইকে কতবার তাঁর সত্তা এবং অবস্থান সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন। একবার বলেছিলেন, ''দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে— এ-সব তো আমি জানি!'' ভাগবত বলবার জন্য ভগবান বক্তা ঠিক করে রাখেন। নইলে মানুষকে কে শোনাবে তাঁর কথা? ঠাকুর ইঙ্গিত করছেন— যেমন শুকদেব ভাগবত প্রচার করেছেন, তেমন প্রতি অবতারের সঙ্গেই কেউ না কেউ আসেন যিনি ঈশ্বরের বার্তা মানবসমাজের কাছে তুলে ধরবেন। মাস্টারমশাইয়ের মনে ঠাকুরের সঙ্গগুণে প্রবল বৈরাগ্য জেগেছিল; তিনিও সংসার মিথ্যা মনে করে অন্যজীবনের কথা ভাবতেন যদি না ঠাকুর তাঁকে সংসারেই থাকতে আদেশ করতেন। ভগবান একটা পাশ দিয়ে ভাগবত-পাঠককে সংসারে রেখে দেন, সে তাঁর এই কাজটি করবে বলে। এটি বিধিনির্দিষ্ট।

ঠাকুর তাঁর সাধনজীবন স্বয়ং গঠন করেছিলেন। ঠাকুরের কাছে তিনি ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় পুরো মাস দক্ষিণেশ্বরে বাস করেছিলেন ব্রতীর মতো, সাধকের মতো। খুব সামান্য আহার, ধ্যান-ভজন আর গুরুসঙ্গ। তার মধ্যে যদি তিনি কোনওদিন বলেছেন একটু কলকাতায় যাবেন, ঠাকুর বাধা দিয়েছেন।

মাস্টারমশাই ঠাকুরের প্রয়াণের পর পঞ্চাশ বছর এই অনুধ্যান করেছেন। কম কথা নয়! গুরু চলে গেছেন, চার বছরের স্মৃতিলিপি রয়েছে, তার চর্চা তার পরিস্ফুটন করেছেন তিনি!... সূত্রাকারে লিখে রাখতেন, তাকেই বিস্তৃত রূপ দান করেছেন। প্রবল সাধনার জীবন ছিল তাঁর। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলতেন, এত গম্ভীর অথচ সরল, এত আন্তরিক, এত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, এত প্রজ্ঞা এত

ভক্তির সমন্বয় কোনও সাধারণ মানুষের হতে পারে না। তিনি সংসার চালাতেন, অর্থ উপার্জন করতেন, সব ব্যবস্থা করতেন কিন্তু এসব করেও অনাসক্তিতে পরিপূর্ণ তাঁর জীবন। গভীর রাত্রে নিজের বাড়ি ছেড়ে 'আমিও অনাথ, অসহায়, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কেউ নেই'—এই বোধ আনবার জন্য গৃহহীনদের মধ্যে শুয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে সেনেট হাউসের বারান্দায় বা সিঁড়িতেও গিয়ে শুতেন। কত তীর্থেও গেছেন তিনি। তাঁর শরীর থাকতে থাকতেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বিকশিত হতে শুরু করেছিল। কখনও কখনও তিনি কোনও মিশন কেন্দ্রে বা মঠ কেন্দ্রে গিয়ে রাত্রিবাস করতেন বা কয়েকদিন থাকতেন কারণ তাঁর মধ্যে খুবই সাধনস্পৃহা ছিল। তিনি ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানতেন না। ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু বলতেন না। বহু মানুষ তাঁর কাছে নিয়মিত আসতেন ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে বহু যুবক সঙ্ঘে যোগদান করেছেন।

কথামৃত প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাংলায় পাঁচটি খণ্ডে বের হয়। এই পাঁচ খণ্ডে যেমন ঠাকুরকে দেখা যায় তেমনই যুগপ্রয়োজন, আরও কত ভক্ত, তাঁদের সুখ, দুঃখ সমস্ত কিছুই ফুটে উঠেছে। এ এক আশ্চর্য রচনা। এই অমর গ্রন্থটির বিষয়েরও কোনও সীমা নেই। সাংসারিক জীবন ও সাধুজীবন সম্বন্ধে অফুরন্ত উপদেশ আছে এতে।

স্বামীজী খুব প্রশংসা করে বলছেন, সক্রেটিসের সম্বন্ধে প্লেটো লিখেছেন কিন্তু প্লেটো অনেক জায়গায় প্রধান বা নিজের বক্তব্য রেখেছেন; কিন্তু কথামৃতে মাস্টারমশাই কোথাও নেই। এইরকম আত্মগোপন, আত্মসংবরণ শুধু গুরুগতপ্রাণ এইরকম সাধকই পারেন।

কথামৃত সম্পর্কে শ্রীশ্রীমার তাঁকে লেখা পত্রখানিই অভিজ্ঞানপত্র : ''তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য।... এক সময় তিনিই তোমার কাছে ওই সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ওই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই ওই সমস্ত কথা বলিতেছেন।'' ''ইহাতে কোনও ভয় নাই''—মা একথাও বলছেন।

কথামৃত মানুষের সম্পদ হয়ে রইল। হয়তো কোনও পুত্রহারা মাতা শোকে সন্তপ্ত, কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারছেন না। তাঁকে কেউ কথামৃত দিয়েছেন। দিনের পর দিন সেটি পড়তে পড়তে তাতে এত আকর্ষণ হল যে সেই তাপ তাতে অনেকখানি প্রশমিত হল। কথামৃত 'তপ্তজীবনম্'। জেলের বন্দিনী লাইব্রেরি থেকে কথামৃত নিয়েছে, আর ফেরত দিতে চাইছে না। সেই বইটিই তার জীবনের অবলম্বন হয়েছে। কতভাবে কথামৃত মানুষকে সহায়তা দিতে পেরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

পরিশেষে, 'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু' বা 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'—বেদবাক্যের মতো ঠাকুরের এই বচনাংশগুলি যেন আমাদের জীবনমন্ত্র হয়। আমাদের অহমিকা যে কত বৃথা, কত মিথ্যা, আমাদের অস্তিত্বের যে আলাদা কোনও মূল্যই নেই, তা যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ✠